PANCHAKOTesSAYS
ISSN : 0976-4968
Vol-13, No.-1, May 2022

রথের রশি: যুগান্তরের সত্য বিশ্ব ইতিহাসের সত্য

ড. সুফল বিশ্বাস [1]*

[1]* সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, সূর্যসেন মহাবিদ্যালয়,শিলিগুড়ি, দার্জিলিং, পশ্চিমবঙ্গ.

বিমূর্ত

"নীচের তলাটা হঠাৎ উপরের তলা হয়ে ওঠাকেই বলে
প্রলয় বরাবর যা প্রচ্ছন্ন তাই প্রকাশ হবার সময়টাই যুগান্ত"

উপরের তলার নিরন্তর চাপে নীচের তলার মধ্যে যে নিরন্তর অস্থিরতা চলে, সেই অস্থিরতারই বহিঃপ্রকাশ আসলে যুগান্তর। মন্ত্রীর উপরের ভাষ্যের যদি এরকম একটা ব্যখ্যা করা যায় তাহলেই বোধ হয় 'রথের রশি' নাটকের রচনার প্রকৃত উদ্দেশ্যের সত্য প্রকাশ হয়। বরাবর যা প্রচ্ছন্ন অথবা যাদের প্রচ্ছন্ন করে রাখার সুপরিকল্পিত প্রয়াস প্রতিনিয়ত উপরতলা করে থাকে তা যখন কোনো মেশিনারী বা রাজনৈতিক কৃৎকৌশলে আর প্রচ্ছন্ন রাখা যায় না, সভ্যতার অবশ্যম্ভাবী সত্যে সেই প্রচ্ছন্নরাই প্রবলভাবে উপরের তলার জগতটা দখল করে, তখনই তা হয়তো যুগান্তর সময়েভিব্যক্ত হয়। মন্ত্রীর মুখনিঃসৃত এই সত্য সভ্যতার বাণী বা রবীন্দ্রনাথের প্রকৃত অভিজ্ঞানকে স্ফুট করেছে বলা যায়। গোটা 'কালের যাত্রা'র চলমান সত্যভাষ আর 'রথের রশি'র প্রতিষ্ঠা বন্ধনের সত্যে এই বাণীই বজ্রঘোষের মতো উচ্চারণ করেছেন রবীন্দ্রনাথ।

চুম্বক শব্দ: নীচতলা, যুগান্তর, কাল, প্রবল, উপরের তলা

১৯২৩ সালে 'প্রবাসী' পত্রিকায় 'রথের রশি' নাটকটি 'রথযাত্রা' নামে প্রকাশিত হয়। 'রথযাত্রার' পরিবর্তিত রূপ 'রথের রশি'। ' রথের রশি' ও 'কবির দীক্ষা', 'কালের যাত্রা'য় (১৯৩২)---দুটি নাটিকা হিসাবে স্থান পায়। এখন প্রশ্ন 'রথের রশি' রবীন্দ্রনাট্যধারায় কেন গুরুত্বপূর্ণ আর কেনই বা বিশ্ব অস্থিরতার মূল শিকড়ের সন্ধানে এই নাটকের আলোচনা জরুরী। এজন্য আমাদের শরৎচন্দ্রের ৫৭তম জন্মদিনে নাটকটি উৎসর্গ করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ যে মন্তব্য করেছিলেন সেই মন্তব্য থেকে শুরু করতে হবে। তিনি শরৎচন্দ্রকে এই নাটকটি সম্পর্কে লেখেন---

> "তোমার জন্মদিন উপলক্ষে 'কালের যাত্রা' নামক একটি নাটিকা তোমার নামে উৎসর্গ করেছি। আশা করি, আমার এ-দান তোমার অযোগ্য হয় নি। বিষয়টি এই---রথযাত্রার উৎসবে নরনারী সবাই হঠাৎ দেখতে পেলে, মহাকালের রথ অচল। মানব-সমাজের সকলের চেয়ে বড়ো দুর্গতি, কালের এই গতিহীনতা। মানুষে মানুষে যে সম্বন্ধবন্ধন দেশে দেশে যুগে যুগে প্রসারিত, সেই বন্ধনই এই রথ টানবার রশি। সেই বন্ধনে অনেক গ্রন্থি পড়ে গিয়ে মানবসম্বন্ধ অসত্য ও অসমান হয়ে গেছে, তাই চলছে না রথ। এই সম্বন্ধের অসত্য এতকাল যাদের বিশেষভাবে পীড়িত করেছে, অবমানিত করেছে, মনুষ্যত্বের শ্রেষ্ঠ অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে, আজ মহাকাল তাদেরই আহ্বান করেছেন তাঁর রথের বাহনরূপে; তাদের অসম্মান ঘুচলে তবেই সম্বন্ধের অসাম্য দূর হয়ে রথ সম্মুখের দিকে চলবে।"২

নিজের কোনো রচনার কোনো নাম নিয়ে পরীক্ষা নীরিক্ষা যদি বিশ্বসাহিত্যে সবচেয়ে বেশি কেউ করে থাকেন, তিনি বোধ হয় রবীন্দ্রনাথ। গোটা পৃথিবীর সাহিত্যের ইতিহাসে নাম যে কোনো রচনার এক বিশেষ মুখপত্র হতে পারে ,---এই সত্য রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কেউ অনুভব করেছেন কিনা সন্দেহ। 'কালের যাত্রা' ও 'রথের রশি' রূপক ও প্রতীকাশ্রয়ী অসাধারণ নাটকে এই নামকরণ এক বড় ভূমিকা নিয়েছে। রথযাত্রার উৎসবে চলছে না মহাকালের রথ। এখানে মহাকালের রথ আসলে মানব সভ্যতা রূপ সদা চলমান রথ। রথ না চললে গোটা মানব সভ্যতায় তৈরি হবে এক অবশ্যম্ভাবী অস্থিরতা। যার ফলে কি ঘটতে পারে সে আশঙ্কা করেছে সন্ন্যাসী,---

"সর্বনাশ এলো।
বাধবে যুদ্ধ, জ্বলবে আগুন, লাগবে মারী
ধরণী হবে বন্ধ্যা, জল যাবে শুকিয়ে"৩

অথচ এ অস্থিরতা তৈরি হবার কথা ছিল না। মানব সভ্যতা রূপ রথ চালাতে গেলে দরকার ছিল সেই রশি। যেখানে মানুষে মানুষে বন্ধনের সত্য ছিল বড়। কিন্তু সেই বন্ধনে নানা অসম্বন্ধের গ্রন্থি পড়ে তা হয়ে গেছে জর্জর। তাই এক প্রবল ক্রমস্থিরতা গ্রাস করছে মানবের সম্পর্কে বন্ধনে। সৈনিকদের প্রতি সন্ন্যাসীর উক্তিতে ধরা পড়েছে সেই সত্য,---

"তোমরা দড়িটাকে করেচ জর্জর,
যেখানে যত তীর ছুঁড়েচ বিঁধেচে ওর গায়ে।
ভিতরে ভিতরে ফাঁক হয়ে গেছে, আলগা হয়েচে বাঁধনের জোর।
তোমরা কেবল ওর ক্ষত বাড়িয়েই চলবে,
বলের মাতলামিতে দূর্বল করবে কালকে।
সরে যাও সরে যাও ওর পথ থেকে।"৪

উপরের তলা শুধু অহংবেধোর নাক উঁচু স্বভাবে নীচের তলার সঙ্গে তার ফারাকটা করে ফেলেছে বেশ বড়ো, সৃষ্টি করেছে ভয়ঙ্কর অস্থিরতা। কালের যাত্রার পথ তাতে হয়ে পড়েছে বন্ধুর। মানবের সঙ্গে মানবের বন্ধন স্বাভাবিক করতে হলে, তাদের মধ্যে নিরন্তর তৈতি হওয়া অস্থিরতা প্রশমন করতে হলে কি করতে হবে তার উত্তর রবীন্দ্রনাথ সন্ন্যাসীর মুখ দিয়ে বলিয়েছেন,---

"কি হবে মন্তরে।
কালের পথ হয়েছে দুর্গম।
কোথাও উঁচু, কোথাও নীচু, কোথাও গভীর গর্ত।
করতে হবে সব সমান, তবে ঘুচবে বিপদ।
দিনে দিনে গর্তগুলোর হাঁ উঠেচে বেড়ে।
হয়েচে বাড়াবাড়ি, সাঁকো আর টিঁকচে না।
ভেঙে পড়লো বলে।"৫

ইতিহাস বলে দেয়, মানব সভ্যতার রথ চলেছে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যের হাতে। এদের মধ্যে সবাই একসময় মনে করেছে তারাই একমাত্র শ্রেষ্ঠ। কিন্তু যখনই নিজেকে সর্বেসর্বা ভেবেছে তখনই হয়েছে বিপদ। মহাকালের রথ গেছে থেমে। সমসাময়িক বিশ্বের রাজনীতিকে রবীন্দ্রনাথ দারুণ ভাবে প্রত্যক্ষ করেছেন এই ইতিহাসের সত্যে,---

"একালের রাজত্বে রাজা থাকেন সামনে,
পিছনে থাকে বেণে। যাকে বলে অর্ধ-বেণে-রাজেশ্বর মূর্ত্তি"

কিন্তু বেণে যেই ভাবতে বসলো সেই সর্বেসর্বা তখনই ঘটলো বিপদ। মহাকালের রথ গেল থেমে। কারণ, তার অনুসন্ধানে জানা গেল---

"*.....*
আজ ধনীর আছে ধন,
তার মূল্য গেছে ফাঁক হ'য়ে গজভুক্ত কপিত্থের মতো।
ভরা ফসলের ক্ষেতে বাসা করেছে উপবাস।
যক্ষরাজ স্বয়ং তার ভান্ডারে বসেচে প্রায়োপবেশনে।
দেখতে পাচ্চ না, লক্ষ্মীর ভান্ড আজ শতছিদ্র।
তাঁর প্রসাদধারা শুষে নিচ্চে মরুভূমিতে---
ফল্‌চে না কোনো ফল।
.....
তোমরা কেবলি করেচ ঋণ,
কিছুই করোনি শোধ,
দেউলে করে দিয়েচ যুগের বিত্ত।
তাই নড়ে না আজ আর রথ---"৬

কোনো একদল যদি মনে করে তারাই মহাকালের রথ চালানোর মূল হোতা তাহলেই আসে বিপদ। একদলের চাপে আরএক দলের মধ্যে তখন তৈরি হয় নানা অস্থিরতা---যে অস্থিরতা ক্রমে গ্রাস করে গোটা মানব সভ্যতাকে। 'রথের রশি' নাটকে ইতিহাসের সত্য ঘাটতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ মানব সভ্যতার নানা শ্রেণীর মানুষের দ্বারা চালিত মানব সভ্যতার রথকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তিনি ইতিহাসের সত্যে ও তথ্যে বুঝতে পেরেছিলেন বর্তমানে মানবসভ্যতার রথ চালোনোর ভার পড়েছে সেই শ্রেণীর উপর যারা চিরকাল ছিল অবহেলিত, বঞ্চিত,লাঞ্ছিত, নিপীড়িত। যাদের জীবনে নানা সময়ে নানা অস্থিরতার জন্ম দিয়ে মানবের বন্ধন রূপ রশিতে তৈরি করা হয়েছে নানা গ্রন্থি যে গ্রন্থি সর্ব মানবের সম্মন্ধে তৈরি করেছে নানা অসমান গভীর গর্ত। ফলত এক বৃহৎ মানব গোষ্ঠী প্রবলের পীড়নে ক্রম অস্থির হতে হতে হঠাৎ করে উপর তলায় উঠে এসে তৈরি করেছে যুগান্তর---মহাকালের রথ চালনার দায়িত্ব বর্তেছে তাদের হাতে। আসলে রাশিয়া বা ইউরোপের নানা গণআন্দোলন প্রত্যক্ষ করে নাট্যকার রবীন্দ্রনাথের ধারণা জন্মেছিল আগামী বিশ্বটা যেতে চলেছে শোষিত অবহেলিত সেই শ্রেণীর হাতে। যাঁরা চিরদিন পেয়েছে অবহেলা অপমান আর সদা অস্থির এক জীবনের ক্রম চালচিত্র---যে তেলরঙা চিত্রে কোনো আলোড়ন নেই, জলাচল রেখো নেই, সবই যেন একরঙা বিবর্ণ কোনো প্রত্যয়।

রথযাত্রা, অথচ রথ চলছে না। চারিদিকে একটা গুমোট পরিস্থিতি, নাটকের শুরুতেই এই পরিস্থিতিকে আরো আকাশচারী করে তোলে নাটকের শুরুর এক প্রতীকমুখী সংলাপ---

"রথের দেখা নেই। চাকার শব্দ নেই"

মানবে মানবে বন্ধনের রজ্জু হয়ে উঠেছে শীতল, শিথিল। 'ঐ যে পথের বুক জুড়ে আছে অসাড় দড়িটা'---এই সম্বন্ধ বন্ধনের অসাড়তার প্রতীকে এক প্রবল অস্বস্তিকর সামাজিক রাষ্ট্রীক অস্থিরময় গুমোট সংকটকে মূর্ত করেছেন নাট্যকার। এই সম্বন্ধ বন্ধন রূপ রশিকে, এই প্রবল অস্থিরময় সংকটের সময়ে কখনো 'রাক্ষুসে সাপ', কখনো 'যেন বাসুকি মরে উঠলো ফুলে', কখনো 'যুগন্তের নাড়ী', 'ডাকিনীর জটা', 'হনুমানের পোড়া লেজ', ইত্যাদি সম্বোধনের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ আসলে মানুষের সঙ্গে মানুষের বন্ধনের স্বাভাবিক শক্তিহীনতায় জন্ম নেওয়া অস্থিরতারই প্রতীকময় প্রকাশ করেছেন।

রথ চলছে না কিন্তু তাকে চালাবার আপ্রাণ প্রচেষ্টা থাকে মানব সভ্যতার রথ চালকদের। কারণ নীচের তলার উপরে ক্রমশ উঠতে থাকাকে আটকানোর জন্য রথ চালানো জরুরী কিন্তু রথ চালানোর জন্যে নীচের তলার সঙ্গে উপরের তলার স্বাভাবিক বন্ধনকে স্বীকার করার জন্য যে সহনশীলতা, সমমর্মিতা ও প্রীতির বন্ধনের প্রয়োজন ছিল উপরের তলা ক্রমশ ভুলে গেছে তার মর্ম্মবাণী। তাই সভ্যতা রথ আবার অচল হয়ে পড়েছে কিন্তু উপরতলার কায়েমী স্বার্থ তা সহজে মানবে কেন? তাই শুরু হয়েছে ভয়ের রাজনীতি, সমাজে অস্থিরতা জন্ম দেওয়ার রাজনীতি।

'রথের রশি' নাটকে নানা সময়ে এই কায়েমী স্বার্থান্বেষীদের দেখা গেছে এই ভয়ের হাতিয়ার ব্যবহার করতে। আলোচ্য নাটকে রথের রশিকে পুজো-অর্চনায় সন্তুষ্ট করার জন্য নারীদের বিভিন্ন লোকাচার ও শুভা-শুভ বোধের প্রকাশে এই ভয়ের একটা পরিবেশ তৈরি করার চেষ্টা হয়েছে। শাসক পরিকল্পিত ভাবে নারীদের এই লোকাচারকে অস্থিরতার সৃষ্টির এক উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করেছে। সমাজের সমস্ত স্তরে এই ভয়ের একটা বাতাবরণ ব্যাপনের সূত্রে ছড়িয়ে দেবার কায়েমী স্বর্থের প্রবণতা এবং তার কারণে তৈরি হওয়া ক্রম অস্থিরতার ঘোলা জলে ফল লাভের কোনো প্রত্যাশা নাটকে এক ভিন্ন প্রতীকের জন্ম দিয়েছে।

কিন্তু দীর্ঘদিনের বঞ্চনায় তৈরি হওয়া উপরের তলার চাপে নীচের তলার পুঞ্জীভূত অস্থিরতা প্রবল বিক্ষোভে যখন ফেটে পড়ে ইতিহাস তৈরি করে তখনই তৈরি হয় যুগান্তর। সেখানে শাসকের কোনো প্রচেষ্টা, কোনো ভয়ের রাজনীতিই আর কাজ করেনা,--- যা অবশম্ভাবী সত্য তা প্রবল ভাবে তার অস্তিত্বের প্রকাশ ঘটায়। 'রথের রশি'র প্রতি পরতে পরতে এই সত্য নানা প্রতীকে ফুটে উঠেছে। তাই রাজা , সৈনিক, পুরোহিত,---প্রত্যেকেই যখন পরাভব স্বীকারে ধ্বস্ত, ক্লান্ত, রিক্ত তখন ঐ 'যাদের নাম করতে নেই' তারা খবর পেল বাবার রথ টানতে হবে তাদের। এই 'যাদের নাম করতে নেই' বক্তব্যের মধ্যে যে অস্পৃশ্যতার কথা বা চোখে আঙুল দিয়ে দেিেখয়ে দেবার সত্য আছে তার প্রতিও রবীন্দ্রনাথ পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন। কারণ যাকে আমরা মানব সভ্যতা বলি তার বিশাল কর্ম যজ্ঞের সঙ্গে এই বিরাট সংখ্যার যোগের কথা যদি অস্বীকার করি তাহলে মানব সভ্যতার রথ অচল হতে বাধ্য এবং তাতে যে, গোটা বিশ্ব মানব সভ্যতাতেই এক ক্রম অস্থিরতার সংক্রম ঘটবে সেই তথ্য এখানে নাট্যকার দ্বিধাহীনভাবে পেশ করেছেন। সুস্থির বিশ্বের মানবসভ্যতা রূপ রথ তখনই সচল হবে যখন কারোর চাপে কেউ বা কোনো স্থানের চাপে কোনো স্থান অস্থির প্রত্যয় নিয়ে বাঁচবে না। আনন্দের সঙ্গে সবাই স্ব-স্ব কর্মক্ষেত্রে কর্মযজ্ঞের অংশীদার হয়ে সবাই মিলে মানব সভ্যতাকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। কেউ অনুযোগ করে বলবে না সভ্যতায় তার অবস্থানের কথা, নিজের প্রবল উপস্থিতির কথা,---

> "আমরাই তো যোগাই অন্ন, তাই তোমরা বাঁচ
> আমরাই বুনি বস্ত্র, তাই তোমাদের লজ্জা রক্ষা।"

আমরাও মানুষ, আমরাও সভ্যতা রূপী রথের চালিকা শক্তি, এই তথ্য যখন এক মানব শ্রেণীর আর এক মানব শ্রেণীকে মনে করিয়ে দেবার প্রয়োজন হয় তখনই তৈরি হয় প্রবল অস্থিরতা। শ্রেণী সংগ্রামের তত্ত্বে তা তখন কখনো হয়ে ওঠে মার্কসের তত্ত্ব, কখনো হয়ে ওঠে সমাজ বদলের বিপ্লব---যুগান্তরের ইঙ্গিত।

'রথের রশি' আলোচনার সঙ্গে অবশ্যই মনে করতে হবে নাট্যকার রবীন্দ্রনাথের লেখা 'রাশিয়ার চিঠি'র কথা। বিশ শতকের তৃতীয় দশকের শেষ বছরে রাশিয়ায় গিয়ে তিনি দেখেছিলেন সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের এক ছাতার নীচে দিনবদলের স্বপ্ন দেখার চালচিত্র। যা তারকাছে মনে হয়েছিল তীর্থ দর্শনের সামিল। দেশের সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষদের নিয়ে তাদের দীর্ঘদিনের বঞ্চনার পুঞ্জীভূত ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশে গোটা রাশিয়ার নতুন রূপে বিশ্ব রাজনীতিতে উত্থান নাট্যকারের মধ্যে প্রবল আলোড়ল তুলেছিল। সবার সুখ-দুঃখ, আশা-নিরাশা তাড়িত জীবনকে সমান ভাবে নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেওয়ার অদ্ভুত এক বিপ্লবী দর্শন নাট্যকার রবীন্দ্রনাথকে প্রবলভাবে নাড়া দিয়েছিল। গোটা বিশ্ব যখন এক সমতল রকমের অস্থিরতার মধ্য দিয়ে চলছে তখন এই বিশ্বেরই একটা বৃহৎ দেশ

নিজের মতো করে রাষ্ট্রীক অস্থিরতাকে প্রশমন করছে এক নবীন বিপ্লবী দর্শনের আলোকে। এক নতুন পথের খোঁজে তাদের মধ্যে নিরন্তর তৈরি হওয়া অস্থিরতাকে সবাই মিলে প্রতিরোধ করছে, নতুন ভাবে সমাজ গড়ার স্বপ্ন দেখছে। সবাই সবার সুখ-দুঃখের অংশীদারীত্বে---এই বৃহৎ কর্মযজ্ঞের বিস্ফোরণে কবিচিত্ত বিস্ফারিত হলো এক নতুন আবেগে।

কবি বিশ্বাস করতেন যাকে আমি বা আমরা ঘৃণা ভরে পিছনে রাখছি তাদের সঙ্গে আমরাও যে মানুষ হিসাবে পিছনে চলে যাচ্ছি ঢুকে পড়ছি এক অকারণ অস্থিরতার মধ্যে-এই অসাম্য ব্যবস্থার প্রতিরোধ করতে হবে, প্রতিবিধান খুঁজতে হবে। নিজেই শুধু ভাষাজ্ঞানের অধিকারী হলে চলবে না, আমাদের আশেপাশে যেসব মূঢ় মূক মুখ, যারা আমাদেরই একক তাদের মুখেও দিতে হবে ভাষা। তাদেরকেও বের করে আনতে হবে পিলসুজের তলা থেকে প্রদীপের আলোর সামনে। তবেই তৈরি হবে এক প্রকৃত সুস্থির সমাজ। বিশ্বের এক বৃহৎ অংশকে যদি আমরা ঘৃণা ভরে সরিয়ে রাখি তাহলে যে ক্রম অস্থির হয়ে ওঠা বিশ্বের জন্ম আমরা দেবো তা গোটা মানব জাতিকেই এক প্রবল অস্থিরতার মধ্যে ঠেলে দেবে। এই মূঢ় মূক মানুষগুলো যারা শোষিত হয়েছে বঞ্চিত হয়েছে ক্রম অস্থির হয়েছে তাদেরকে নিয়ে, তাদের অস্থিরতার বিক্ষোভকে পাথেয় করে রাশিয়ার জেগে ওঠা কবিকে চকিত করেছিল। 'রথের রশি' নাটকে ঐ 'যাদের নাম করতে নেই' তাদের জেগে ওঠা, তারাই যে আগামী দিনে মহাকালের রথের মূল চালিকাশক্তি হতে চলেছে,---এই সাধারণ মানুষের জেগে ওঠাকেই, তাদের দীর্ঘ দিনের অক্লান্ত কর্মযজ্ঞ যা গোটা পৃথিবীর প্রকৃত চালিকা শক্তি তাকেই স্বীকৃতি দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ।

মহাকালের রথ গেছে থেমে। সমাজের যারা দন্ডমুন্ডের কর্তা, যারা দীর্ঘকাল নিজেদের বেবেছে বিকল্পহীন মহাকালের রথের চালক তারা প্রত্যেকে বিফল হয়েছে রথ টানতে। সবাই যখন শ্রান্ত, ক্লান্ত, বড় কিছুর অঘটনের আতঙ্কে বিপর্যস্ত তখন একটা হৈ হৈ রব শোনা গেল। পিল পিল করে ঘেমো ঘেমো লোক এসে জড়ো হলো মহাকালের রথের কাছে। যাদের কোনো নির্দিষ্ট পরিচয় নেই, নেই কুল-গোত্র, শুধুমাত্র অস্পৃশ্য সংখ্যাতেই যাদের শুধু গোনা হয়। সমাজের সভ্যতার প্রকৃত চালক অথচ কোনো কৌলিণ্য নেই, সেই লোকগুলো স্পর্ধাভরে বললো মহাকালের রথ চালাবে। যাদের সঙ্গে নিজেদের আলাদা করতে গিয়ে নাক উঁচুরা বলেছে---

> ''ক্ষত্রিয় আমরা, শূদ্র নই, নই গোরু
> চিরদিন আমরা চড়েই এসেছি রথে।
> চিরদিন রথ টানে ঐ ওরা---যাদের নাম করতে নেই।''৭

শাস্ত্রের জোরে যাদের আলাদা করে রাখা হয়েছিল দীর্ঘকাল তারাই বললো রথ চালাবে। চিরকাল সংখ্যা লঘিষ্টের হাতে নিয়ত অস্থির হয়ে থাকা সংখ্যাগরিষ্ঠের এভাবে সামনের সারিতে উঠে আসাকেই রবীন্দ্রনাথ যুগান্তরের সময় বলে চিহ্নিত করেছেন। নাটকে দলপতির বক্তব্যে কেন যুগান্তর সৃষ্টি হতে হবে তারও ব্যাখ্যা শোনা গেছে। তাদের হাতে বাবার মহাকালের রথ চলবে, এ খবরই বা তাদের কে দিল তার উত্তর জানতে চাইলে সে যা বলেছে তার মধ্যে শোনা গেছে এক প্রতীকময় ইঙ্গিত,---

> ''আমরা এলেম বাবার রথ চালাতে।
> এতদিন আমরা পড়তেম রথের চাকার তলায়,
> দ'লে গিয়ে ধুলোয় যেতুম চ্যাপ্টা হয়ে।...
> এবার তিনি ডাক দিয়েছেন তার রশি ধরতে।'
> অবাক হয়ে পুরোহিত জিজ্ঞাসা করে,---
> 'এখবর তাদের কে দিল?' তার উত্তরে দলনায়ক বলে---
> ''কেমন করে জানা গেল সে তো কেউ জানে না।

ভোরবেলায় উঠেই সবাই বললে সবাইকে,
ডাক দিয়েছেন বাবা। কথাটা ছড়িয়ে গেল পাড়ায় পাড়ায়,
পেরিয়ে গেল মাঠ, পেরিয়ে গেল নদী,
পাহাড় ডিঙিয়ে গেল খবর,
ডাক দিয়েছেন বাবা।''৯

'পেরিয়ে গেল মাঠ, পেরিয়ে গেল নদী', 'পাহাড় ডিঙিয়ে গেল খবর', বা 'কথাটা ছড়িয়ে গেল পাড়ায় পাড়ায়'---এই সংলাপ আসলে সেই গণজাগরণের প্রতীক, সেই মানুষগুলোর নিজের প্রকৃত শক্তির প্রতি বিশ্বাসের প্রতীক, যাঁরা দীর্ঘকাল ছিল শোষিত, অবহেলিত, বঞ্চিত, এক বৃহৎ মানব এককের সভ্যতায় নিজের শক্তিকে আয়নায় দেখার প্রতীক। 'পাড়ায় থেকে পাড়ায়'---এই বক্তব্যের মধেও আছে এক বিরাট অংশের জাগরণের সংকেত। একই জীবনে অভ্যস্ত সমতল রকমের আশা-নিরাশা তাড়িত জীবনে অভিযোজিত এক বৃহৎ অংশের সমভাবনায় সমপ্রাণতায় একীভূত হওয়ার রূপক রয়েছে এখানে।

যুগের পর যুগ ধরে যাদের তাচ্ছিল্য করা হয়েছে, যাদের নিয়ত কর্মযজ্ঞের কথা 'ওরা কাজ করে' কবিতায়' একটু ভিন্ন রূপকে ধরবার চেষ্টা করেছেন রবীন্দ্রনাথ, তাদেরকেই একটি অন্যরূপে মহাকালের রথ টানবার আহ্বান জানিয়েছেন। মহাকালের রথ না চলার জন্য যে ক্রম অস্থির স্থবির বিশ্বের দিকে আমরা এগোচ্ছি সেই বিশ্বের চলমানতার প্রতীক করে তোলা হয়েছে এই নাম না জানা অসংখ্য একীভূত হওয়া সংখ্যাকে। তিনি ইতিহাসের সূত্র ধরে বুঝতে পেরেছিলেন যারা নিয়ত পিছিয়ে পড়া শ্রেণী বা কায়দা করে যাদের পিছিয়ে রাখা হয়েছে সেই শ্রেণীর হাতেই এগিয়ে চলবে মানব সভ্যতার রথ। পুরোহিতের প্রাণঘাতী ব্যাঙ্গ, ব্রাহ্মণের ব্যর্থ ব্রহ্ম অভিশাপ, সৈনিকের সগর্ব তাচ্ছিল্য ও রক্তচক্ষুর আস্ফালন, আগামী মৃত্যুর পরোয়াণা কোনো কিছুই তার রথের রশি হাতে রথকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়াকে আটকাতে পারবে না। মানুষের সঙ্গে মানুষের বন্ধন দুর্বল হয়েছে এইসব সাধারণ মানুষকে, তাদের সুস্থির জীবনকে অস্বীকারের মাধ্যমে। রথের রশির বাইরে পড়ে থাকা আসলে সম্পর্কের বন্ধনের দৈনতা। কবির কণ্ঠে প্রকাশিত হয়েছে নাট্যকারের এই মনের কথা,---

''রথের দড়ি কি পড়ে থাকে বাইরে।
সে থাকে মানুষে মানুষে বাঁধা, দেহে দেহে প্রাণে প্রাণে।
সেইখানে জন্মেছে অপরাধ, বাঁধন হয়েছে দুর্বল।''১০

বাঁধন দুর্বল হলেই, স্পষ্ট নানা শ্রেণী বিভাজনের পৃথিবী তৈরি হয়,---তৈরি হয় সমগ্র মানব সভ্যতায় নানা খন্ড খন্ড অস্থির ভরকেন্দ্র। মহাকালের রথ নানা অস্থির ভরকেন্দ্র চালাতে পারে না। কারণ সবাই সবার মতো করে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চললে তবেই রথ আপনা আপনি গড়িয়ে চলে। আজকে একদলের কর্মযজ্ঞে রথ চললো আর সে দল ভেবে নিল তারাই সব, তারাই মহাকালের রথের একমাত্র চালক---এই অহং ভাব আর অন্যের থেকে সে যে আলাদা এই মনোভাবই মহাকালের রথের পথ বন্ধুর করে তোলে। 'রথের রশি' নাটকে সমাজে বেশি সুবিধা প্রাপ্ত শ্রেণীর অন্য শ্রেণীকে মানব শ্রেণী না মনে করার নিম্ন মানসিকতাই মহাকালের রথের পথ বন্ধুর করে তুলেছে সভ্যতায়---ইতিহাসের সত্যকে অস্বীকার করার কারণেই যে মহাকালের রথ থমকে যাবে এই সত্যের প্রকাশ ঘটেছে আলোচ্য নাটকে। যেখানে রবীন্দ্রনাথের স্পষ্ট এক শ্রেণী চেতনার দারুণ প্রকাশ ঘটেছে। যার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের প্রখর রাজনৈতিক চেতনার প্রাখর্য লক্ষ্য করেছেন ড. সুকুমার সেন,---

''রথযাত্রা রথের রশি রবীন্দ্রনাথের একমাত্র পুরোপুরি পোলিটিক্যাল নাট্যরচনা ... বোধকরি
আকারে খর্ব বলিয়াই নজরে পড়ে না।''১১

আমরা মনে করি ড. সেনের মন্তব্য অত্যুক্তি নয় বরঞ্চ এক অসাধারণ সুচিন্তিত মূল্যায়ন। রবীন্দ্র নাট্যধারায় এমন অসাধারণ রাজনৈতিক নাট্য রচনা বোধ হয় আর নেই। শুধু বাংলা নাট্যসাহিত্য বা ভারতীয় উপমহাদেশের নাট্য

সাহিত্যের ইতিহাসে নয়, গোটা পৃথিবীতে এমন অসাধারণ রূপক সাংকেতিকতায় মোড়া অর্থবহ রাজনৈতিক নাটক খুব বেশি নেই বলেই মনে হয়।

ইতিহাসের সত্যে নাট্যকার রাজনৈতিক প্রজ্ঞায় জেনেছেন মহাকালের রথ এক সময় টেনেছে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যরা। এখন পালা এসেছে তাদের যারা দীর্ঘদিন ধরে ছিল প্রকৃত অর্থে মহাকালের রথের চালক। অথচ তাদের শক্তিকে অস্বীকার করা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের এই ভাবনার মধ্যে আসলে মানব সভ্যতায় নানা শক্তির ভরকেন্দ্রকে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে প্রকারন্তরে। যার মধ্যে তৈরি হওয়া ক্রম অস্থিরতায় গোটা মানব সমাজের বন্ধন দুর্বল করে ফেলেছে। উচ্চশ্রেণী বা সুবিধাপ্রাপ্ত শ্রেণী ভাবে তারাই সভ্যতার মুখ বা তারাই মানবসভ্যতার প্রকৃত চালক---তার এই অহংবোধ তাকে যেমন সূক্ষ্ম অর্থে অস্থির করে তোলে তেমনি তার 'যাদের নাম করতে নেই' তাদেরকে নিজেদের শ্রেণীর একক বলে অস্বীকারের মানসিকতায় তৈরি করে অস্থিরতা। যা ক্রমে নানা শ্রেণীর মানব এককের অস্থিরতায় পরিণত হয়। তাই রথের দড়ি পড়ে থাকে রাস্তায়। কখনো সে রাক্ষুসে সাপ, ডাকিনীর জটা, হনুমানের পোড়া লেজ, আবার কখনো বা মরে ফুলে ওঠা বাসুকী রূপে পরিচিত হয়। মানব সম্পর্কের মধ্যে তৈরি হওয়া অস্থিরতার আন্তর্জাতিক পরিচয়ের এমন রাজনৈতিক ব্যাখ্যাই 'রথের রশি'কে অন্য মাত্রা দিয়েছে।

ইতিহাসের সত্যে এই সত্য নাট্যকার স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন একসময় সমাজের সে অগণিত শ্রেণীও একদিন ভেবে বসবে তারাই এক অপ্রতিরোধ্য শক্তি যারা মহাকালের রথের সেই চালক, যারা ছাড়া রথ অচল। তখন তৈরি হবে আবার এক অস্থিরতা। পুরোহিত ও কবির কথোপকথনে উঠে এসেছে সেই তথ্য,---

"পুরোহিত ।। তোমার শূদ্রগুলোই কি এত বুদ্ধিমান---
ওরাই কি দড়ির নিয়ম মেনে চলতে পারবে।

কবি ।। পারবে না হয়তো।
একদিন ওরা ভাববে, রথী কেউ নেই, রথের সর্বময় কর্তা ওরাই।
দেখো, কাল থেকেই শুরু করবে চেঁচাতে---
জয় আমাদের হাল লাঙল চরকা তাঁতের।
তখন এঁরাই হবেন বলরামের চেলা---
হলধরের মাতলামিতে জগৎটা উঠবে টলমলিয়ে।"১২

তখন হয়তো আবার আসবে উল্টোরথের পালা। বড়ো যখন নাক উঁচু হয়ে ছোটোকে অস্বীকার করে তখনই মহাকালের রথ থেমে যায়। কারণ অসমান সম্পর্কের বাঁধন দৃঢ় হয়না। মানব জীবন ছন্দে সংগতি রাখতে ঠাকুর পাশ ফেরেন শূদ্রের দিকে। অন্যদিকটা বেশি উঁচু হয়েছিল বলে ঠাকুরের এই পাশ ফেরা যাতে উঁচু নিচুর ফারাকটা বড়োমাপের ফারাক না হয়ে ওঠে। শূদ্রগুলোও যদি ফারাক বড়ো করে তোলে তাহলে আবার আসে উল্টোরথের পালা। কবিরা হলেন সভ্যতার বিবেক। তারই বুঝিয়ে দেন বন্ধন কেন কিভাবে শিথিল হয়ে যায়,---কোন ছন্দে এই বন্ধন আবার দৃঢ় হয়,---

"গায়ের জোরে নয়, ছন্দের জোরে
আমরা মানি ছন্দ, জানি এক-ঝোঁকা হলেই তাল কাটে।
মরে মানুষ সেই অসুন্দরের হাতে
চাল-চলন যার একপাশে বাঁকা;
কুম্ভকর্ণের মতো গড়ন যার বেমানান,
যার ভোজন কুৎসিত,
যার ওজন অপরিমিত।

আমরা মানি সুন্দরকে। তোমরা মানো কঠোরকে।
বাইরে ঠেলা-মারার উপর বিশ্বাস,
অন্তরের তাল-মানের উপর নয়।"১৩

অলোচ্য নাটকে কবি কথিত ছন্দ আসলে ছন্দহীন ক্রম অস্থির হয়ে ওঠা মানব সম্পর্কের ছন্দ। যার তাল কাটলে অস্থির হয় রথের রশি, অস্থির হয় মানব সম্পর্ক, মানব সভ্যতা। এই ছন্দের সঙ্গতি বিধানে সভ্যতার বিবেক হন কবি। তিনিই সুরেলা কণ্ঠে জীবনের ছন্দের কথা জীবনের দ্বারে দ্বারে লিরাবাদ্য নিয়ে গেয়ে ফেরেন,---

"ছন্দের সঙ্গতি রাখিবার জন্যই ঠাকুর আজ শূদ্রদের দিকে পাশ ফেরালেন। অন্যদিকটা বেশী উঁচু হইয়াছিল বলিয়া নীচে দাঁড়াইলেন ছোটদের দিকে। সেইখানে হইতে টান দিয়া বড়কে কাৎ করিয়া, সমান করিয়া নিলেন নিজের আসনটা। এই ছন্দের মিল, সুরের সঙ্গতি প্রভৃতির জন্য দরকার হয় কবির। কবিই আমাদের বুঝাইয়া দেন, সব মানুষই সমান--- সবার ভিতরই রহিয়াছে ঐশ্বরিক শক্তির কণা---কেহ কাহারও অপেক্ষা বড় নয়, কেহ কাহারও অপেক্ষা ছোট নয়।"১৪

আলোচনার শুরুতে উল্লেখ করা হয়েছে নব নির্মিত রাশিয়ার কথা---নতুন ভাবে জেগে ওঠা রাশিয়ার কথা। শ্রমজীবী খেটে খাওয়া মানুষকে নিয়ে তাদের সংঘবদ্ধ শক্তির সাহায্যে রাশিয়ার নতুন পৃথিবী গড়ার স্বপ্ন নাট্যকার কবি তৃতীয় নয়নে মায়া কাজল পরে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। রাশিয়া ভ্রমণ কালে রবীন্দ্রনাথ দেখেছিলেন এই সাধারণ মানুষের শক্তির বিপুলতা। রবীন্দ্রনাথ সরাসরি কোনোদিনই কোনো রাজনীতি বা রাষ্ট্রীক বিপ্লবের সঙ্গে নিজেকে সরাসরি যুক্ত করেননি। কিন্তু 'কালের যাত্রাতে' কবি ও সৈনিকের কথোপকথনে যে বার্তা আমরা পেয়েছি তা কিন্তু সুস্পষ্ট একটি রাজনৈতিক সমর্থনের ইঙ্গীতবাহী। সেখানে কবির ভূমিকা কি, সেকথাও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় প্রকাশিত। সৈনিক একসময় কবিকে বিপ্লবের আগুনের ভয় দেখালে কবি বলেন---

"যুগাবসানে লাগেই তো আগুন।
ছাই হবার তাই ছাই হয়,
যা টিঁকে যায় তাই নিয়ে সৃষ্টি হয় নবযুগের।
সৈনিক---তুমি কী করবে কবি।
কবি---আমি তাল রেখে রেখে গান গাব।
সৈনিক---কী হবে তার ফল?
কবি---যারা টানছে রথ, তারা পা ফেলবে তালে তালে।
পা যখন হয় বেতালা
তখন ক্ষুদে ক্ষুদে খালখন্দগুলো মারমূর্ত্তি ধরে।
মাতালের কাছে রাজপথও হয়ে ওঠে বন্ধুর।"১৫

সাধারণ শোষিত যুগ যুগ ধরে বঞ্চিত লাঞ্ছিত মানুষের সাধারণ তন্ত্রকে এখানে সমর্থনের স্পষ্ট ইঙ্গিত যেমন আছে তেমনি আছে এক বিশেষ রাজনৈতিক উত্থানের সমর্থন। যা দেখে আমরা প্রমান করতে পারি শ্রদ্ধেয় ড. সেন কথিত পোলিটিক্যাল তত্ত্বের সারবত্তা। পাশাপাশি একজন কবি শিল্পীর এই রাজনৈতিক উত্থানে কি ভূমিকা তাও পরিষ্কার করে দিয়েছেন নাট্যকার রবীন্দ্রনাথ। শক্তির হাত বদলের যে নাট্যরূপ তিনি তৈরি করেছেন তাতে ইতিহাসের সত্যের সঙ্গে রাজনৈতিক সত্যের এক অপূর্ব মেলবন্ধন দেখা গেছে এই নাটকে,---

"এই রূপক নাটকটির ভিতর দিয়া রবীন্দ্রনাথ যেন শক্তির হাত-বদলের ইতিহাসকেই বিবৃত করিতেছেন। পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই এক সময় সকল ক্ষমতার অধিকারী

হিসাবে রাজার প্রতিষ্ঠা দেখা গিয়াছে। তারপর আমাদের দেশে ব্রাহ্মণদের ক্ষমতা শক্তির চরম শিখরে উঠিয়াছে। তেমনি আবার পুরাকালে গ্রীসের এথেন্‌স্ প্রভৃতি নগরীতেLeisured class-ই সকল ক্ষমতার অধিকার উপভোগ করিত। ইহার পর কিছুকাল সর্বদেশেই পুরোহিত এবং ধর্মযাজকগণের প্রভাব পরিলক্ষিত হয় Industrial Revolution-এর পর হইতেই পৃথিবীর সর্বত্র ক্যাপিটালিস্টদের প্রভাব দেখা যাইতে থাকে। ধনতন্ত্রের অবসানের আরম্ভ হয় শ্রমিক জাগরণের শুরু হইতে।"১৬

কিন্তু এই সাধারণ মানব শ্রেণীর এই শক্তির বিপুলতা ও কর্মযজ্ঞের ক্রম অভিব্যক্তিও কবিকে একসময় চিন্তান্বিত করেছিল। তাদের মধ্যেও ধীরে ধীরে তৈরি হওয়া অহংবোধ কবির মনে কোনো একসময় প্রশ্ন চিহ্ন তুলে দেয়। নইলে তিনি বলতেন না,'একদিন ওরা ভাববে রথী কেউ নেই, রথের সর্বময় কর্তা ওরাই। তার এই বক্তব্যই নাটকের অন্য এক রাজনৈতিক মেরুকরণের ইঙ্গিত দেয়। গভীর রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ছাড়া এরকম অসাধারণ অভিজ্ঞান আশা করা যায় না। যেদিকে খেয়াল করে সমালোচক বলেন,--

"পৃথিবীতে শ্রমিক দিগের আধিপত্যের প্রতিষ্ঠার পরই যে এই ইতিহাস সমাপ্তীর পথে যাইবে একথাও কেহ বলিতে পারে না। হয়তো ভবিষ্যতে শ্রমিক দলও একদিন বিলুপ্ত হইবে এবং মনুষ্য-সমাজে সকল শ্রেণীগত পার্থক্যের অবসান হইবে। সেদিন হয়তো রাষ্ট্রেরও আর কোনো আবশ্যক থাকিবে না, সকল মানুষ সৌভ্রাত্র- বন্ধনে বদ্ধ হইয়া সুখে কাল কাটাইবে। এ অবস্থায় সত্যসত্যই কোনোদিন পৃথিবী আসিবে কিনা এবং তারপর আবার নূতন করিয়া মনুষ্য-সমাজে দলগত এবং শ্রেণীগত পার্থক্য জন্মিতে থাকিবে কিনা কে বলিতে পারে।"১৭

কবির মন্তব্যেও ধরা পড়েছে এই একই সত্য,---

"এইবেলা থেকে বাঁধনটাতে দাও মন---
রথের দড়িটাকে নাও বুকে তুলে, ধুলোয় ফেলো না;
রাস্তাটাকে ভক্তিরসে দিওনা কাদা করে।
আজকের মত বলো সবাই মিলে---
যারা এতদিন মরে ছিল তারা উঠুক বেঁচে,
যারা যুগে যুগে ছিল খাটো হয়ে, তারা দাঁড়াক একবার মাথা তুলে"১৮

প্রায় একশো বছর আগে ধ্যানমগ্ন ঋষির মতো গভীর প্রজ্ঞায় কবির তৃতীয় নয়ন দিয়ে রবীন্দ্রনাথ পৃথিবী কেন অস্থির হয়ে উঠছে তার মূল শিকড়ের সন্ধানে খুঁজে পেয়েছিলেন মানুষে মানুষে যে সম্পর্কের বন্ধনহীনতায়, তারই নাট্যরূপ রথের রশি। উপরিউক্ত কবির উক্তিতে এই অস্থির বিশ্ব থেকে মানব গোষ্ঠীর বেরিয়ে আসার সমাধান সূত্র এভাবেই আবিষ্কার করতে চেয়েছেন তিনি।

সূত্রোল্লেখ উৎস ও টীকা :

১.রথের রশি, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
২. বিচিত্রা, কার্ত্তিক সংখ্যা ১৩৩৯।
৩. রথের রশি, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
৪. রথের রশি, ঐ।

৫. রথের রশি, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
৬. রথের রশি, ঐ।
৭. রথের রশি, ঐ।
৮. রথের রশি, ঐ।
৯. রথের রশি, ঐ।
১০. রথের রশি, ঐ।
১১. বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, সুকুমার সেন, তৃতীয় খন্ড।
১২. রথের রশি, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
১৩. রথের রশি, ঐ।
১৪. রবীন্দ্রনাট্য পরিক্রমা, অশোক সেন।
১৫. রথের রশি, ঐ।
১৬. রবীন্দ্রনাট্য পরিক্রমা, অশোক সেন।
১৭. রবীন্দ্রনাট্য পরিক্রমা, ঐ।
১৮. রথের রশি, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।